Bangladesh Journal of Integrated Thoughts, 2024
DOI: https://doi.org/10.52805/ddzng461

বই রিভিউ

আত্মসমর্পনের দ্বন্দ্ব জেফরি ল্যাং এর মানসিক সফরের ধারাবিবরণ

মুসা আল হাফিজ[১]

প্রফেসর ড. জেফরি ল্যাং বিদ্যাচর্চায় বরেণ্য নাম। গণিতের উচ্চতর বহু মৌলিক গবেষণা করেছেন তিনি। আমেরিকার স্টেট ইউনিভার্সিটির বিখ্যাত অধ্যাপক ইসলাম গ্রহণ করে এক অনুপম আখ্যান রচনা করেন, যা সত্যের জন্য হৃদয়ের সফরের অনন্য ইতিবৃত্ত হয়ে উঠেছে। তার যাত্রাপথে ছিলো বহু চড়াই-উৎরাই। রক্ষণশীল রোমান ক্যাথলিক পিতা-মাতার সন্তান জ্যাফরি ল্যাং প্রথম ১৮ বছর পড়াশোনা করেন ক্যাথলিক বিদ্যালয়ে। ঈশ্বর ও খ্রিস্টধর্ম নিয়ে তার জিজ্ঞাসা ছিলো বিস্তর। জবাব না পেয়ে ধর্মের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলেন। হয়ে যান নাস্তিক। এরপর একদা পরিচয় হয় মুসলমান একটি পরিবারের সাথে। উপহার হিসেবে পান পবিত্র কুরআন।

নিজের সমস্ত জিজ্ঞাসাকে একত্র করে তিনি কুরআনের সামনে বসেন। কুরআন তাকে একে একে জবাব দিয়ে দিয়ে কীভাবে জীবনের নতুন উদ্যানে হাজির করলো, তা এক বিস্ময়কর ইতিবৃত্ত। সেটাই তিনি রচনা করেছেন বিশ্বকাঁপানো বই স্ট্রাগলিং টু সারেন্ডার গ্রন্থে। বাংলায় তা অনূদিত হয়েছে 'আত্মসমর্পণের দ্বন্দ্ব' নামে। ইসলাম গ্রহণের নেপথ্যের প্রেরণা ও দ্বন্দ্বমুখর মনস্তাত্ত্বিক অভিজ্ঞতার যে জ্ঞানতাত্ত্বিক বিবরণ এতে পাওয়া যায়, তা সত্যসন্ধানী সর্বমানুষের চিত্তচারী। (বইটি অনুবাদ করেছেন ড. আবু খলদুন আল মাহমুদ, প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থট ; বিআইআইটি)

বইটি মোট পাঁচ অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রতিটি অধ্যায় সম্পর্কে সামান্য ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করব এই লিখনিতে। প্রথম অধ্যায়টি তার ইসলাম গ্রহণের গল্প আমাদের সামনে তুলে ধরে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে এই অবিস্মরণীয় সিদ্ধান্তের পেছনে কোরআনের প্রেরণা ও ভূমিকা আমরা আবিষ্কার করতে পারব। লেখকের ভাষ্যমতে পরবর্তী তিনটি অধ্যায় প্রথম দুই অধ্যায়েরই পরিশিষ্টের মতো; ইসলাম গ্রহণের পর যেসব সমস্যা ও সংকট মোকাবেলা করতে হয়েছে, তার বিবরণ এবং যা কিছু মোকাবেলাহীন রয়ে গেছে সে সম্পর্কে তার নিজস্ব কিছু প্রস্তাবনা। এ হচ্ছে সংক্ষিপ্ত আলোকপাত। এবার আমরা বইয়ের অন্দরমহলে প্রবেশ করি।

প্রথম অধ্যায়: শাহাদাহ

বইটির প্রথম অধ্যায় জ্যাফরির ইসলাম গ্রহণের জটিল যাত্রাকে ভাষাদান করেছে। এই অধ্যায়ের চমৎকার এক ব্যাপার হচ্ছে প্রফেসর ল্যাংয়ের শৈশবের দেখা একটি স্বপ্ন, যা তিনি বেশ কয়েকবার দেখেছিলেন। তার ভাষায়—এটি ছিল আসবাবপত্রবিহীন একটি ছোট কক্ষ; এর ধূসর-সাদা দেয়ালে ছিল না কোনো কিছুই । এর একমাত্র চোখে পড়ার মতো অলঙ্করণ ছিল এর মেঝে ঢাকা লাল-সাদা কার্পেট। ঘরের একমাত্র জানালাটি ছিল আমাদের ওপরে এবং আমাদের দিকে মুখ করা যা উজ্জ্বল আলো দ্বারা কক্ষটিকে আলোকিত করছিল। আমরা ছিলাম সারিবদ্ধভাবে। আমি তৃতীয় সারিতে; সকলেই পুরুষ, কোনো মহিলা চোখে পড়ছে না; আমরা জানালার দিকে মুখ করে আমাদের গোড়ালি এবং নলীর ওপর ভর করে বসে আছি। আশপাশের কাউকেই চিনতে পারছিলাম না। নিজেকে বহিরাগত মনে হচ্ছিল। সম্ভবত অন্য কোনো দেশে আছি। আমরা সবাই একসাথে একইভাবে মাটিতে মুখ ছোঁয়ালাম। প্রশান্ত ও নিস্তব্ধ পরিবেশ, যেন সমস্ত জগত শান্ত, নিঃশব্দ । হঠাৎই আমরা একসাথে উঠে বসলাম, অতঃপর দাঁড়ালাম, সম্মুখে তাকাতেই খেয়াল করলাম, সামনের সারি থেকে কেউ একজন আমাদের পরিচালনা করছেন। তিনি আমার সামনের সারির মাঝখানে আমার বাঁয়ে, জানালার নিচে দাঁড়ানো, সেই সারিতে একমাত্র তিনিই দাঁড়িয়ে । আমি শুধু তাঁর পেছনের দিকটিই একনজর দেখলাম। তার পরনে লম্বা সাদা গাউন মাথায় লাল ডিজাইনযুক্ত সাদা চাদর রুমাল। এটা দেখার পরই আমার ঘুম ভেঙে গেল।'

জ্যাফরি ল্যাং বলেন— এই স্বপ্ন আমি পরবর্তী দশ বছরের মতো সময়কালে প্রায়ই দেখতাম। প্রথম প্রথম আমার কাছে এটা অর্থপূর্ণ কিছু মনে হয়নি। পরবর্তীতে আমার এই বিশ্বাস জন্মালো যে, এই স্বপ্নের সাথে ধর্মীয় কোনো কিছুর সম্পর্ক থাকতে পারে। আমি আমার দু-একজন ঘনিষ্ঠ ব্যক্তির সাথে এই স্বপ্নের বিষয়ে আলাপ করেও এর কোনো মানে খুঁজে বের

[১] Centre for Islamic Thought & Studies, Jatrabari Email: 71.alhafij@gmail.com

করতে পারিনি। যদিও এই স্বপ্নের মানে বুঝতে না পারায় আমার কোনো কষ্টও হচ্ছিল না। প্রতিবার স্বপ্ন দেখার পর বেশ প্রশান্তির সাথে আমার ঘুম ভাঙত।

অবশেষে তার ইসলাম গ্রহণের পর প্রথম জুমার সালাত আদায়ের সময়, হঠাৎই তিনি আবিষ্কার করেন এটাই তার বারংবার দেখা শৈশবের সেই রহস্যময় স্বপ্নের বাস্তব রূপ। সেই আসবাবপত্রহীন ছোট্ট কক্ষ; ধূসর সাদা দেয়াল আর মেঝেতে বিছানো লাল সাদা কার্পেট। যেন নীরবতার চাদরে ঢেকে থাকা প্রশান্ত ও নিস্তব্ধ এক জগত। সারিবদ্ধ কিছু মানুষ উঠছে বসছে; যাদেরকে পরিচালনা করছে সবার সামনে একা দাঁড়িয়ে থাকা সাদা গাউন ও লাল রুমাল পরিহিত অপর একজন মানুষ। ঘরের একমাত্র জানালাটি তার মাথার উপর থেকে পুরো রুমকে আলোকিত করছে। এ যেন নবি ইউসুফ আ. এর সেই কোরআনি ঘটনারই পুনরাবৃত্তি– ইয়া আবাতি হাজা তা’ উইলু রু’ ইয়ায়া মিন কবল্....

এটি এই অধ্যায়ের সবচেয়ে চমৎকার জায়গা হলেও এ অধ্যায়ের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমি আলোকপাত করবো। অথবা বলা যায় ইসলাম গ্রহণ অবধি প্রফেসর ল্যাংয়ের অভিযাত্রাকে তিনটি পর্বে বিভক্ত করে এই আলোচনাকে এগিয়ে নিয়ে যাব।

১ম পর্ব: খৃষ্টবাদে সংশয়

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তা'লা বলেছেন–

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًاۚ فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِى فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَاۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

‘অতএব তুমি একনিষ্ঠ হয়ে দীনের জন্য নিজকে প্রতিষ্ঠিত রাখ। আল্লাহর ফিতরাত, যে ফিতরাতের উপর তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই। এটাই প্রতিষ্ঠিত দীন; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।’

আয়াত থেকে স্পষ্ট যে আল্লাহ তায়ালার মানুষকে একটি ফিতরাত বা স্বভাব ধর্মের উপর সৃষ্টি করেছেন আর সেই ফিতরাত হচ্ছে দীনে হানিফ বা সত্য ধর্ম।

এ বিষয়ে সুস্পষ্ট হাদিসও এসেছে। ইমাম ইবনে হিব্বান আবু হুরাইরা রাজি. এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

كلُّ مولودٍ يولَدُ على الفطرةِ فأبواه يُهوِّدانِه أو يُنصِّرانِه أو يُمجِّسانِه

প্রতিটি আদম সন্তানের জন্ম হয় তার ফিতরতের উপর। অতঃপর বাবা-মা তাকে হয়তো ইহুদি বানায়, অথবা খ্রিস্টান অথবা অগ্নিপুজক। [সহিহ ইবনে হিব্বান, হাদিস নং ১২৯]

এই ফিতরাতকে আল্লাহ মানুষের অন্তরে ও মস্তিষ্কে একটি অপারেটিং সিস্টেমের মতো স্থাপন করে দিয়েছেন, যা জীবনভর মানুষকে সঠিকভাবে অপারেট করবে। ফিতরাত তথা এই ব্যাপারটি অন্য ভাষায় বলা হয় ‘আহদে আলাসৎ’ । আহদ অর্থ অঙ্গিকার বা প্রতিজ্ঞা। ফলে এর অর্থ দাঁড়ায় ‘আলসৎ’ এর প্রতিজ্ঞা। ‘আলাসৎ’ শব্দটির একক অর্থ এখানে উদ্দেশ্য নয়। বরং এটি একটি বিশেষ ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করে, যা সুরা আ’ রাফের ১৭২ নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। আসুন আয়াতটির দিকে আমরা নজর দিই।

আল্লাহ বলেন–

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَفِلِينَ

আর স্মরণ কর, যখন তোমার রব বনী আদমের পৃষ্ঠদেশ হতে তাদের বংশধরকে বের করলেন এবং তাদেরকে তাদের নিজদের উপর সাক্ষী করলেন যে, 'আমি কি তোমাদের রব নই'? তারা বলল, 'হ্যাঁ, আমরা সাক্ষ্য দিলাম।' যাতে কিয়ামতের দিন তোমরা বলতে না পার যে, নিশ্চয় আমরা এ বিষয়ে অনবহিত ছিলাম।

এখানে একটি বিশেষ সাক্ষ্যগ্রহন ও প্রতিজ্ঞার বিষয় আমরা দেখি, যেখানে আল্লাহ সকল আদম সন্তানের কাছ থেকে তার রব হওয়ার স্বীকৃতি নিয়েছেন। আল্লাহ সকলের বনি আদমের উদ্দেশ্যে জিজ্ঞেস করেছেন, 'আমি কি তোমাদের রব নই'? সকলে বলেছে, 'হ্যাঁ, আমরা সাক্ষ্য দিলাম আপনি আমাদের রব।' এই সাক্ষ্য ও স্বীকৃতিই মূলত প্রতিটি বনি আদমের অন্তরে গেঁথে দেওয়া হয়েছে ফিতরাত হিসেবে। অপারেটিং সিস্টেম হিসেবে। এই অঙ্গীকারমূলক বাক্যের প্রথম শব্দটি 'আলাসতু' , যার অর্থ আমি কি নই? দ্বিতীয় শব্দ 'বিরব্বিকুম, অর্থাৎ তোমাদের প্রতিপালক। অর্থ দাঁড়ায়, 'আমি কি নই তোমাদের প্রতিপালক?' তো এই অঙ্গীকারমূলক বাক্যের প্রথম শব্দটি নিয়ে তৈরি হয়েছে 'আহদে আলাসতু' বাক্যটি। অর্থাৎ আলাসতু এর শপথ বা অঙ্গীকার।

তো কখনো সমাজ, পারিপার্শ্বিকতা ও পরিস্থিতি এই ফিতরাতকে ঢেকে দেয়। ফলে মানুষ সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়। যেমন যদি অমুসলিম পরিবারে একটি শিশু জন্মগ্রহণ করে, তখন বাবা-মা, আত্মীয়-স্বজন ও পরিবেশ-প্রতিবেশ সবকিছুই ফিতরাতের প্রতিকূল থাকে। ফলে খুব সহজেই ফিতরাত ঢাকা পড়ে যায়। কখনো মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করা সত্ত্বেও এই ফিতরাত ঢাকা পড়ে, যদি বাবা-মা নিষ্ঠাবান মুসলিম না হয়। তবে যত যা-ই হোক, যেহেতু ফিতরাত হিসেবে আল্লাহ সত্য দ্বীনকে অন্তরে স্থাপন করে দিয়েছেন, তাই একটা সময় অবশ্যই তা ভেতরে নড়ে চড়ে উঠে, নিজের অস্তিত্বের জানান দেয়। কেবল বুদ্ধিমান মানুষ এবং যার প্রতি আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ রয়েছে, তারাই এই আহ্বানের তাৎপর্য উপলব্ধি করে এবং হৃদয়ের ডাকে সাড়া দিতে পারে। প্রফেসর জেফরি ল্যাং এমনই একজন বুদ্ধিদীপ্ত, সৌভাগ্যবান ও আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহপ্রাপ্ত মানুষ, যিনি ফিতরাতকে উপলব্ধি করতে পেরেছেন এবং হৃদয়ের আহ্বানে সাড়া দিয়েছেন।

মানুষের ভেতর আল্লাহ যে ফিতরাত স্থাপন করে দিয়েছেন, তা হচ্ছে তাওহিদ। যখন তাওহিদের নামে, ধর্মের মোড়কে এমন কিছু উপস্থাপন করা হবে, যা আদতে আল্লাহপ্রদত্ত ফিতরাতের বিরোধী, তখন মানুষ সেটাকে গ্রহণ করতে পারবে না। অন্তর থেকেই বাঁধা আসবে। অন্তরস্থ ফিতরাত তাকে গ্রহণ করতে সক্ষম হবে না। ফলে মানুষ পুরোপুরিই ধর্মবিরোধী ও স্রষ্টাবিরোধী হয়ে যাবে। এই ব্যাপারটা গনহারে ঘটেছিল মধ্যযুগের ইউরোপে। গির্জা এমন কিছু বিষয়কে ধর্মের নামে বাজারজাত করেছে, যার সাথে আদৌ আসমানী ধর্মের সম্পর্ক নেই। ফলে ইউরোপের লোকেরা এই নামসর্বশ্ব ধর্মের বিরুদ্ধে ঢালাওভাবে বিদ্রোহ করে বসেছে।

এবার এই দীর্ঘ আলোচনার যোগসূত্র খুঁজে বের করা যাক প্রফেসরের ইসলাম গ্রহণের অভিযাত্রায়। প্রত্যেক বনি আদমের অন্তরে আল্লাহ যেহেতু একটি ফিতরাত স্থাপন করে দিয়েছেন, ফলে তিনিও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। তবে ক্যাথোলিক পরিবারে জন্মগ্রহণের ফলে প্রতিকূল পরিবেশে সেই ফিতরাত বিকশিত হতে পারেনি। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাকে প্রচুর মেধা ও সূক্ষ্মদর্শিতা দিয়েছেন। ছোটবেলা থেকেই গনিত তার প্রিয় বিষয় এবং এমন জটিল একটি বিষয়েই তিনি ডক্টরেট ডিগ্রি নিয়েছেন– এ থেকেই তার তীক্ষ্ণ মেধার পরিচয় পাওয়া যায়।

কিছুটা উপলব্ধির বয়সে তার মনের মধ্যে ধর্ম নিয়ে নানান প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। ধর্ম বলতে ক্যাথলিক ক্রিশ্চিয়ানিজম। এক সময়ে মনের ভেতর ঘুরপাক খেতে থাকা কিছু প্রশ্ন তার ধর্ম বিষয়ক ক্লাসে যুক্তি তর্ক সহকারে উত্থাপন করেন। ফলশ্রুতিতে সেই ক্লাস থেকে তাকে বের করে দেওয়া হয় এবং বলা হয় মত পরিবর্তন করার আগ পর্যন্ত যেন ক্লাসে না আসে। অন্যথায় এই সাবজেক্টে তাকে ফেইল দেওয়া হবে। বলা যায় এই ঘটনাই প্রফেসরের জীবনের স্রষ্টানুষন্ধানের অভিযাত্রার প্রথম মাইলফলক।

এভাবেই সময় গড়াতে থাকে আর মনের ভেতর থাকা স্রষ্টাবিষয়ক প্রশ্নগুলো ক্রমশ ঘনীভূত হতে হতে প্রবল ঘূর্ণিঝড়ের রূপ নেয়। ব্যাপক অনুসন্ধান ও ঘাটাঘাঁটি সত্বেও এইসব প্রশ্নের কোনো উত্তর তিনি কোথাও পাননি। যেহেতু এই প্রবল ঘূর্ণিঝড়কে বাধা দেওয়ার মতন কোন কিছুই তার সামনে ছিল না। তাই দীর্ঘ সংশয়বাদী যাত্রার পর ১৮ বছরের পরিণত বয়সে পুরোদস্তুর একজন নাস্তিকে পরিণত হন প্রফেসর জেফরি ল্যাং।

প্রফেসরের একক জীবনে যেই জার্নিটা আমরা দেখছি, মধ্যযুগের ইউরোপে সামগ্রিকভাবে এই ঘটনাটা ঘটেছিল। ইউরোপের জ্ঞানী, বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান মানুষগুলো হঠাৎ করে ফুঁসে ওঠে গির্জার বিরুদ্ধে। কারণ গির্জা ধর্ম হিসেবে যা দেখাচ্ছিল, তা আল্লাহপ্রদত্ত মানবীয় ফিতরাত গ্রহণ করতে পারছিল না। ফলে তারা এই ধর্ম ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসে। প্রখ্যাত আরব গবেষক ও চিন্তাবিদ মুহাম্মাদ কুতুব তার গ্রন্থ 'মাজাহিব ফিকরিয়্যাহ মুআসারা এর শুরুতে সুদীর্ঘ দুটি ভূমিকা এনেছেন, এর প্রথমটি হচ্ছে– বাইনাদ দীন ওয়াল কানিসাহ অর্থাৎ গির্জা ও ধর্মের সংঘাত। এই ভূমিকায় তিনি বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেছেন ইউরোপে চার্জ ও ধর্মের দ্বন্দ্ব ও দূরত্বগুলোকে। ধর্মের ভুল ব্যাখ্যা যে মানুষকে ধর্মবিমুখ ও নাস্তিক্যবাদের দিকে নিয়ে যেতে পারে এবং ইউরোপে ঠিক এটাই যে ঘটেছিল এই উপলব্ধি আমি প্রথম অর্জন করি প্রসিদ্ধ নওমুসলিম লেখক ও জার্মান কূটনীতিবিদ প্রয়াত ড. মুরাদ হফম্যান লিখিত 'ইসলাম ২০০০ বইটিতে। তখন আমার ভেতর এই আশঙ্কাও কাজ করে যে, এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি ব্যাপকভাবে না হলেও সীমিত আকারে মুসলিম সমাজেও ঘটে। ফলে ধর্মের ব্যাখ্যা দেওয়ার ক্ষেত্রে ধর্মতাত্ত্বিকের আরো সতর্ক হওয়া উচিত।

২য় পর্ব: নাস্তিক সময়ের অভিজ্ঞতা

প্রফেসরের নিজের জবানিতে তার নাস্তিক সময়ের অভিজ্ঞতাটা আমরা শুনবো। এটা গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এ ধরনের অভিজ্ঞতা কেবল তার একারই নয়। প্রত্যেক নাস্তিকের অভিজ্ঞতাই কাছাকাছি। নাস্তিক হবার পর প্রথম সময়টা বেশি ফুরফুরে আর আকাশে ডানা মেলা মুক্তস্বাধীন পাখির মতোই লাগে। কোন জিজ্ঞাসা ও জবাবদিহিতা নেই। কোন আদেশ নিষেধের সীমাবদ্ধতা নেই। পাপ পুণ্যের সমীকরণ নেই। স্বর্গ-নরকের চিন্তা নেই। যেন দুনিয়াটাই এক স্বর্গ।

প্রফেসরের ভাষায় শোনা যাক তার নাস্তিক সময়ের অভিজ্ঞতা– "নাস্তিক হওয়ার পর প্রথম প্রথম আমার কাছে নিজেকে বেশ মুক্ত মনে হচ্ছিল। আমি বেশ অনুভব করছিলাম যে, কোনো অলৌকিক শক্তি সব সময় আমার চিন্তা ও কাজ পর্যবেক্ষণ করছে এমন ভীতি থেকে আমি মুক্ত। আমি শুধু নিজের জন্যই বাঁচব: কোনো অতি মানবীয় শক্তিকে আমার সন্তুষ্ট করতে হবে না। আমার নিজেকে খানিকটা সাহসী মনে হচ্ছিল যে, ভাবতাম আমার জীবনের যাবতীয় বিষয়ের ওপর নিয়ন্ত্রণ নেয়ার সাহস ও ক্ষমতা আমার আছে। আমার চিন্তা, কল্পনা, অনুভূতি কোনো কিছুই কোনো অজাগতিক শক্তির বা সত্তা কিংবা অন্য কারো সাথে ভাগ করার প্রয়োজন নেই। আমি নিজেই আমার ভুবনের কেন্দ্রবিন্দু; আমিই আমার জগতের স্রষ্টা, পালক এবং নিয়ন্ত্রক। আমার জন্য কোনটি ভালো আর কোনটি মন্দ, কোনটি সঠিক আর কোনটি বেঠিক তা নির্ধারণের কর্তৃত্ব শুধু আমারই। আমিই আমার নিজের স্রষ্টা ও ত্রাণকর্তা হয়ে পড়লাম; এর মানে এই নয় যে, আমি সম্পূর্ণ আত্মকেন্দ্রিক, স্বার্থপর বা লোভী হয়ে গিয়েছিলাম। বরং আমি যেন আরো দায়িত্বশীল এবং সমাজের অন্যদের প্রতি দরদী অনুভূতিসম্পন্ন হয়েছিলাম। তবে আমার অন্যের প্রতি দায়িত্ববোধটুকু পরকালে কোনো পুরস্কার পাওয়ার লোভ থেকে সৃষ্ট নয় বরং যেন প্রকৃত অর্থেই এক মানবীয় ভালোবাসা।

এসব হচ্ছে নাস্তিক হবার প্রথম দিনগুলোর চিন্তা ও অভিজ্ঞতা। কিন্তু এই অবস্থাটা অল্প কিছুদিনই অব্যাহত থাকে। এর পরে আসে ভয়ংকর সময়। কারণ আল্লাহ প্রদত্ত মানব-ফিতরাত কখনোই নাস্তিকতাকে গ্রহণ করে নিতে পারে না। ধীরে ধীরে মনের প্রশান্তি ও আনন্দগুলো হারিয়ে যেতে থাকে। কোন কিছুতেই তৃপ্তি ও সন্তুষ্টি আসেনা। হতাশা ও অবসাদ চতুর্দিক থেকে গ্রাস করে নেয়। পৃথিবীটা ছোটো হয়ে আসে, যেন এক অন্ধকার কয়েদখানা। এক টুকরো প্রশান্তির জন্য প্রাণ ছটফট করে। কিন্তু আনন্দের হাজারো উপসর্গ থাকা সত্ত্বেও মন প্রশান্ত হয় না।

প্রফেসরের নাস্তিক জীবনের অভিজ্ঞতাও এমনই, যা বইয়ের পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলোতে তিনি বর্ণনা করেছেন। একপর্যায়ে তিনি অসহ্য হয়ে আবারো খ্রিস্ট ধর্মে ফিরে যেতে চান। কিন্তু সেখানেও শান্তি খুঁজে পায় না তার মন। এখান থেকেই ইসলামের দিকে তার যাত্রা শুরু।

৩য় পর্ব: ইসলাম গ্রহণের পথে

এই পর্বের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে একজন মুসলিমের বাহ্যিক আচার ব্যবহার ও চালচলন যে একটি দাওয়াহ, তা উপলব্ধি করা যায়। প্রফেসর ইসলাম সম্পর্কে জানতে আগ্রহী হন সর্বপ্রথম একজন মুসলিম মেয়েকে দেখে। মেয়েটি ছিল আরব এবং একই বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের স্নাতক ডিগ্রিধারী। তার পোশাক পরিচ্ছদ ও আচার ব্যবহার প্রফেসরকে যারপরনাই মুগ্ধ করেছিল।

প্রফেসর দ্বিতীয় বারের মতন একজন আরব মুসলিম ছেলেকে দেখে তার প্রতি আকৃষ্ট হন। ছেলেটির নাম মাহমুদ কান্দিল। বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি ক্লাস নিতে গিয়ে তার সাথে পরিচয়। প্রফেসর তার ব্যক্তিত্বে ও চালচলনে এত বেশি মুগ্ধ হন, যা তাকে নিয়ে প্রফেসরের দীর্ঘ বর্ণনায় ফুটে ওঠে। এক পর্যায়ে প্রফেসর মাহমুদ কান্দিলের পরিবারের সাথে পরিচিত হন, আর পরিবারটি নিজেদের একজন সদস্যের মতোই তাকে আপন করে নেয়। পরিবারের সকলেই ছিলেন আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রের অধিকারী। দীর্ঘদিনের পরিচয় ও বন্ধুত্বের একপর্যায়ে তারা তার হাতে কুরআন ও ইসলাম সম্পর্কে কিছু বই পত্র তুলে দেন। এরপরের চমৎকার গল্পটা, যা প্রফেসরের জীবনকে পাল্টে দিয়েছিল; জানতে আপনাকে বইটির দ্বারস্থ হতে হবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ আল কোরআন

কুরআনের বাণী শুনে মক্কার কাফেররা কেন ইসলাম গ্রহণ করত, এই রহস্য উদ্ধার করা মুসলিম হয়ে জন্মগ্রহণকারী আমাদের প্রজন্মের জন্য এখন একটি অকল্পনীয় ব্যাপার। এর কারণ কোরআনের সাথে আমাদের সম্পর্কহীনতা ও দূরত্ব। কাফেররা কোরআন শুনে জাদুগ্রস্থের মত হয়ে পড়তো কোরআনের বাক্য, ছন্দ ও বিষয়বস্তু তাদেরকে মোহগ্রস্ত করে ফেলত। ফলে তারা একে জাদুকরী গ্রন্থ এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জাদুকর আখ্যা দেয়। আজকের যুগে মুসলিমদের হৃদয়ে কুরআনের এই প্রবল প্রতাপ হাজির আছে কি? নেই। ফলে জেফরি ল্যাং আমাদের সেভাবে কুরআন অনুধাবন করার আহ্বান জানান। কুরআনের কাছে তিনি জীবনের সমস্ত প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন। কোরআন তার জীবনকে, তার দৃষ্টিভঙ্গিকে আমূল বদলে দিয়েছে। কোরআন সংক্রান্ত বইয়ের এই অধ্যায়টি আমাকে সবচেয়ে বেশি মুগ্ধ করেছে। একই সাথে মনে হয়েছে এটি এই বইয়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য অংশ। এই অধ্যায়ে মোট ১৪ টি শিরোনাম রয়েছে। প্রথমেই লেখক বর্তমান সময়ে কোরআন অনুধাবনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য তুলে ধরেছেন বিশেষত নও মুসলিমদের উদ্দেশ্য করে। তবে আমার কাছে মনে হয়েছে কথাগুলো মুসলিমদের জন্য সমান জরুরী। এই অধ্যায়ের প্রথম শিরোনাম 'কোরআন সম্পর্কে আমার প্রাথমিক মূল্যায়ন যুক্তিভিত্তিক চ্যালেঞ্জ' । মূলত এই পুরো অধ্যায় জুড়ে তিনি কোরআনকে নানাভাবে নানা দিক থেকে মূল্যায়ন করেছেন। কোরআন বিষয়ক তার প্রাথমিক মূল্যায়ন হচ্ছে, এটি একটি যুক্তিভিত্তিক চ্যালেঞ্জ গোটা মানবজাতির সামনে। সেটা কীভাবে? কেন? তার বিবরণ তিনি এখানে উপস্থাপন করেছেন। বিশেষত কোরআন বহু জায়গায় চিন্তা করতে ও যুক্তি খাটাতে বলেছে। আবার যারা চিন্তা করে না ও যুক্তি খাটায় না তাদেরকে বিচারবুদ্ধিহীন, নির্বোধ ও বোকা বলে তিরষ্কার করা হয়েছে। এ থেকেই প্রমাণিত হয় কোরআন যুক্তিকে কতটা গুরুত্বপূর্ণ মনে করে এবং তার সমস্ত চ্যালেঞ্জগুলো যুক্তিভিত্তিক। এখানে যে গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে তা হচ্ছে প্রতিটি ধর্মের মানুষের ধর্ম বিষয়ক নিজস্ব অভিজ্ঞতা। অর্থাৎ একটি ধর্ম নিয়ে তার অনুসারীদের অভিজ্ঞতা কতটুকু সুখকর, বা সেই ধর্ম তার অনুসারীদের জীবনে ও আচার-আচরণে কতটুকু অংশে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম, তার উপর নির্ভর করে উক্ত ধর্মের সততা ও স্বচ্ছতা ও স্বকীয়তা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের নাম 'কুরআনের অনুপম বৈশিষ্ট্য' । একজন নও মুসলিম হিসেবে কুরআনের যে অনুপম ও বৈশিষ্ট্য গুলো তার চোখে ধরা পড়েছে, তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে দিয়েছেন। ইহুদি বা খ্রিস্টান বংশোদ্ভূত কোন পাঠক কোরআন পড়তে গেলে তাদের পরিচিত ধর্মগ্রন্থের চাইতে কোরআনের যে প্রধান বিশিষ্টতা ও স্বাতন্ত্র্য তাদের চোখে ধরা পড়বে তা তিনি উল্লেখ করেছেন। এক্ষেত্রে কোরআন সম্পর্কে তার একটি গুরুত্বপূর্ণ মূল্যায়ন হচ্ছে, অন্য ভাষায় অনূদিত কুরআনের ভাষ্যসমূহ অবশ্যই ত্রুটিপূর্ণ এবং চূড়ান্ত বিশ্লেষণে তা না কোরআন আর না এর অনুবাদ, বরং ব্যাখ্যা মাত্র।

পরবর্তী পরিচ্ছেদে 'ওল্ড ও নিউ টেস্টামেন্ট এর সাথে কোরআনের তুলনা শিরোনামে তিনি উপরোক্ত বিষয়গুলোই আরো বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করতে সচেষ্ট হয়েছেন। এ প্রসঙ্গে ড. মরিস বুকাইলি এবং অন্যান্য আরো যারা ইতোপূর্বে লিখেছেন, তাদের উদ্ধৃতি ব্যবহার করে তিনি চলমান নানা বিতর্কের বিশ্লেষণ করেছেন; বিশেষত কোরআনের ব্যাপারে আরোপতি বিভিন্ন প্রশ্ন ও অপবাদের চরিত্র নিরুপণ করে তার যথাযথ খণ্ডনে প্রবৃত্ত হয়েছেন।

'কুরআন ও বিজ্ঞান' শিরোনামে পরবর্তী প্রবন্ধটিও সমকালীন বিচারে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। কোরআনের বিভিন্ন আয়াত থেকে আধুনিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন আবিস্কারের সূত্র খোঁজার একটা প্রবণতা চলছে বিশ শতকের শেষ দিক থেকে। একথা অনস্বীকার্য যে কোরআনে নানা প্রসঙ্গে জগতের নিয়মাবলী ও ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে যে তথ্য দেওয়া হয়েছেন, তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। তবে বিজ্ঞানের সমস্ত সূত্র ও আবিষ্কারের সাথে কোরআনের সাদৃশ্য খুঁজতে যাওয়াটা অনেক সময়ই বিভ্রান্তিকর। ফলে এই প্রবণতাকে তিনি প্রশ্ন করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'এ বিষয়ে অনেক মুসলিম পণ্ডিত আমারই

মতো Understanding Islam গ্রন্থে শুন (Schoun) যা বলেছেন তার সাথে একমত হবেন। তিনি বলেছেন, কুরআন নাজিলের পেছনে আল্লাহতায়ালার প্রধান লক্ষ মানুষকে রক্ষা করা, মুক্তি দেয়া; শিক্ষা দেয়া বা লেখাপড়া করানো নয়; আল্লাহতায়ালার উদ্দেশ্য বাহ্যিক জ্ঞান দেয়া নয় বরং মানুষকে প্রজ্ঞাবান করা এবং মানুষের কৌতূহল নিবৃত্তকরণও এর উদ্দেশ্য নয়। এই সতর্কতা মাথায় রেখেও আমরা বলতে চাই যে, কুরআনের অলৌকিকত্ব প্রমাণের এসব গবেষণার গুরুত্ব আমরা অস্বীকার করতে পারি না। বরং এসব গবেষণা ঐশী কিতাব হিসেবে কুরআনের গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে বর্তমান প্রজন্মের কাছে ভালো অবদান রাখছে। তবে কুরআনে বিজ্ঞান নিয়ে ঢালাও গবেষণার বিষয়ে ইসলামি পণ্ডিতদের সতর্ক থাকার আরো একটি কারণ আছে; যে কোনো আধুনিক বা সর্বশেষ আবিষ্কার প্রসঙ্গে এটা খোঁজার চেষ্টা করা যে, সে বিষয়ে কুরআনে আগে থেকেই কোনো ইঙ্গিত ছিল এমন যুক্তি দেয়ার প্রবণতা থেকে দূরে থাকাই উত্তম; পরমাণু থেকে অণুর সৃষ্টি, মহাশূন্যে কৃষ্ণ গহ্বরের উপস্থিতি, মানুষের আঙুলের ছাপের অনুপমতা এমন সব কিছুর মধ্যেই কুরআনী দলিল বা ভবিষ্যদ্বাণী খোঁজার চেষ্টা একটি জীবন দর্শন হিসেবে কুরআনের ব্যবহারকে হ্রাস করে।' এছাড়াও এই প্রবণতা কোরআনের অনেক শব্দের মূল অর্থকে বিকৃত করতেও ভূমিকা রেখেছে। যার কিছু উদাহরণ তিনি প্রবন্ধের পরবর্তী অংশে তুলে ধরেছেন।

এভাবে এই অধ্যায়ের পরবর্তী পরিচ্ছেদগুলোতে কোরআনে বর্ণিত রূপক, চিত্রকল্প নিয়ে আলোচনা করেছেন, এবং ঈমানের সাথে যুক্তিবাদের সম্পর্ক, কোরআনে বর্ণিত জ্বিন ও শয়তানের ধারণা, ইহকাল ও পরকালের কনসেপ্ট, কোরআনের আলোকে পৃথিবীতে মানবজীবনের উদ্দেশ্য, সরল পথের পরিচয় ইত্যাদি বিষয়ে যারপরনাই পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা করেছেন।

তৃতীয় অধ্যায়ঃ আল্লাহর রাসুল (সা.)

এই অধ্যায়টি শুরু হয়েছে নাটকীয়ভাবে, রাসুলুল্লাহ সা. এর মৃত্যুর পর মদিনার পরিস্থিতি বিবরণের মধ্য দিয়ে। চমকদার গল্প তৈরীর উদ্দেশ্যে এভাবে সূচনা হয়েছে তা নয়, বরং রাসুলুল্লাহ সা. কে পরিচিত করিয়ে দেওয়ার পূর্বে তার সময়ের মানুষের মধ্যে তিনি কতটা নন্দিত, বরিত ও প্রিয়পাত্র ছিলেন, তা দেখানোই লেখকের উদ্দেশ্য। এরপর শুরু করেছেন রাসুলুল্লাহ সা. এর পরিচয়ের বিবরণ এবং সেটা সর্বশ্রেষ্ঠ উৎস কোরআনের মাধ্যমে। বলাবাহুল্য যে, এটি একটি বিজ্ঞ ও

পণ্ডিতসুলভ কাজ হয়েছে। কারণ গতানুগতিক সিরাত বা নবিজীবনী সংক্রান্ত বইগুলোতে এই ধারা অনেকটাই দুর্লভ, অর্থাৎ কোরআনের মাধ্যমে রাসুলুল্লাহ সা. এর পরিচয় তুলে ধরা। বিপরীত চিত্র হিসেবে নবিজি সা. এর পরিচিতি তুলে ধরতে গিয়ে মুসলিম সমাজে যে দুর্বল গালগল্প প্রচলিত আছে, তার একটি দৃষ্টান্ত তিনি ধরেছেন নিজস্ব অভিজ্ঞতার জায়গা থেকে।

পরবর্তী পরিচ্ছেদে হাদিস, সুন্নাহ ও সিরাত বিষয়ে প্রাথমিক পরিচিতি তুলে ধরতে সচেষ্ট হয়েছেন এবং তারপর বাইবেল ও হাদিসের ধারণার মধ্যকার সূক্ষ্ম ও সুস্পস্ট পার্থক্যগুলো নিরুপণ করেছেন। এই অধ্যায়ের সবচেয়ে বড়, গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য অংশ হচ্ছে হাদিসের পশ্চিমা সমালোচনা বিষয়ক প্রায় ২৭ পৃষ্ঠাব্যাপী দীর্ঘ প্রবন্ধটি। একজন পশ্চিমা নাগরিক হিসেবে হাদিসের উপর পশ্চিমাদের আরোপিত বিভিন্ন অভিযোগ ও আপত্তির মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করা তার জন্য সহজ। ফলে প্রাথমিকভাবে হাদিসের উপর পশ্চিমা গবেষকদের প্রধাণ আপত্তিগুলো উল্লেখ করে তার মধ্যে কোনটা কতটা শক্তিশালী অভিযোগ আর কোনটা দুর্বল তা দেখানোর চেষ্টা করেছেন এবং ধারাবাহিকভাবে তা খণ্ডনও করেছেন তার অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা ও পাণ্ডিত্যের আলোকে।

চতুর্থ অধ্যায়ঃ মুসলিম উম্মাহ

এই অধ্যায়ের সূচনাটা হয়েছে লেখকের শৈশবের একটি ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে। ৫০-৬০ এর দশকে বর্ণবাদের আগুন দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়েছিল গোটা আমেরিকায়। সে সময়ের একটি ঘটনা। কিছুদিন আগেই এক কৃষ্ণাঙ্গ বালককে পিটিয়েছে শেতাঙ্গ ছেলেরা। সেদিন তার প্রতিশোধ নিতে খেলার মাঠ ঘেরাও করে শতাধিক কৃষ্ণাঙ্গ ছেলেদের একটি দল। জেফরি ল্যাং সেই ঘেরাওয়ের মধ্যে আটকা পড়েন। যদিও তিনি নির্দোষ ছিলেন এবং সেই সূত্রে ওদের হামলা থেকে বেঁচেও যান, তবে তার সে সময়কার মানসিক অবস্থা কি ছিল, তা ব্যক্ত করতে গিয়ে তিনি বলেন– আমাদের মনের অবস্থা বোঝাতে ভয় বা শঙ্কা শব্দ দুটো অপর্যাপ্ত। বরং বলা যায় এক ধরনের অবসর নেতা এবং আসন্ন মৃত্যুর ভাবনা আমাদের গ্রাস করল। পুরো ঘটনাটা বলার পর তিনি চলে যান তার ইসলাম গ্রহণ পরবর্তী আরেকটি অভিজ্ঞতায়। যেখানে দেখা যায় সান ফ্রান্সিসকো বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন কৃষ্ণাঙ্গ মুসলিম দাঈর আলোচনা তিনি ও তার মতো বেশ কয়েকজন শেতাঙ্গ মুসলিম বসেছিলেন এবং

কথাপ্রসঙ্গে তার পূর্বকার জাতিভেদ ও সাম্প্রদায়িকতার বিষয়টিও উঠে। এক পর্যায়ে তারা এই ফলাফলে পৌঁছে যে, একমাত্র ইসলামের শক্তিতেই তারা এই সাম্প্রদায়িকতা ভুলে এক টেবিলে বসতে সমর্থ হয়েছে। ইসলামই পারে গোটা মানবজাতির মাঝে ঐক্য, সংহতি ও সৌহার্দ্য তৈরি করতে।

অবশ্য এই অধ্যায়ে প্রফেসর অনেক বিষয়ে ইসলামের সিলসিলাগত চিন্তার বাইরে নিজস্ব মতামত প্রদান করতে চেয়েছেন, যদিও যথেষ্ট নম্রতার সাথে। এক্ষেত্রে কোনো কোনো জায়গায় নিজের মতামতের পক্ষে দলিল উত্থাপনের ক্ষেত্রে বিচ্যুতিরও শিকার হয়েছেন। বলাবাহুল্য যে, এর মধ্যে অধিকাংশই নারীর অধিকার, নারীর পোশাক, পর্দা, নারী নেতৃত্ব ও নারীর সহশিক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে। অবশ্য তিনি স্বীকারও করেছেন যে, এতদসংক্রান্ত মতামত প্রদানে তিনি যে সমাজ-সংস্কৃতিতে বড় হয়েছেন, তার কিছুটা প্রভাব থাকবে।

প্রফেসর বলেন– 'আমি এখন মুসলিম সমাজে নারী এবং পুরুষের অবস্থান, কাজ ও মর্যাদা প্রসঙ্গে আলোচনা করতে চাই। তার আগে একটি কথা স্বীকার করে নেওয়া উচিত যে, এসব বিষয়ে এবং এই বইতে আলোচিত সব বিষয়ে প্রদত্ত আমার মতামতে আমার ওপর আমি যে সমাজ-সংস্কৃতিতে বড় হয়েছি তার ভিত্তিতে অর্জিত দৃষ্টিভঙ্গির কিঞ্চিৎ প্রভাব থাকবে। আর বাস্তবে সেটাই দেখা গেছে। ইসলামের নারী অধিকার প্রশ্নে প্রথমত তিনি পশ্চিমের কিছু বিভ্রান্তির অপনোদন করেছেন যদিও; কিন্তু অনেক জায়গায় তিনি ইসলামের মূলধারার ব্যাখ্যাকে পরিত্যাগ করেছেন। তবে এই অধ্যায়ে পরিবার, স্বামী স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্ক, বিবাহ-তালাক ইত্যাদি সামাজিক বিষয়গুলোর দূরদর্শী ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। অবশ্য আইন ও রাষ্ট্র, ক্ষমতা ও বিশ্বাস, জিহাদ ও মুরতাদ বিষয়ক তার আলোচনা অনেক ক্ষেত্রেই তিনি ইসলামের মূলধারার সাথে বিতর্কমূলক, নিজস্ব মতামত।

পঞ্চম অধ্যায়: আহলে কিতাব

এই অধ্যায়ের আলোচনাকে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব ও আন্তধর্মীয় সংলাপের জায়গায় রেখে বিচার করাটা সহজতর। যদিও দ্বিতীয় অধ্যায়ে কোরআনের ও বাইবেলের তুলনামূলক কিছু বিষয় এনেছেন, তবে এখানে এই ধারার আরো কিছু বিষয় কিছুটা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। এখানে প্রসঙ্গ ধরে ইসরাইল ফিলিস্তিন সমস্যার বিষয়টিও উঠে এসেছে, যেহেতু এটি ইহুদি খ্রিস্টান ও মুসলিম এই তিন ধর্মের একটি রাজনৈতিক সংঘাতের কেন্দ্রবিন্দু।

শেষ কথা: আমরা যদি বইটির নামের দিকে একটু গভীর দৃষ্টি দেই, তাহলে বিষয়বস্তুর গভীরতা ও বিস্তৃতি কিছুটা হলেও উপলব্ধি হবে। ইসলাম অর্থ আত্মসমর্পণ। পারিবারিক সূত্রে বেড়ে ওঠা একজন মুসলিম সাধারণত ইসলাম নিয়ে মনের ভেতর কোনো দ্বন্দ্ব অনুভব করে না এবং সামাজিকভাবে তার ইসলাম পালনে কোনো বাঁধা নেই। কিন্তু বর্তমান সময়ের একজন শেতাঙ্গ আমেরিকানের পক্ষে বিষয়টি ততটা সহজ নয়, যেমন সহজ ছিল না মক্কায় বসে ইসলাম গ্রহণ করা। একটা দীর্ঘ ও জটিল মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক দ্বন্দ্বের ভেতর দিয়ে তো যেতে হবেই; তার উপর যদি আমেরিকার মতো একটা দেশ হয়, তবে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিসরে এই দ্বন্দ্বটা জীবনের শেষ পর্যন্ত টেনে নিয়ে যেতে হবে। তবে এই অবস্থার মধ্যে দিয়ে যখন কেউ যায়, তার এমন কিছু উপলব্ধি ও অভিজ্ঞতা হয়, যা সাধারণ মুসলিমদের কখনোই হবে না। হয়তো সবাই সে উপলব্ধিটা ব্যক্ত করতে পারে না, অথবা সবার যাত্রাটাও এতটা জটিল ও কন্টকাকীর্ণ হয় না, যতটা হয়েছে এই মার্কিন গণিতবিদের। এই বই একজন অমুসলিমের জন্য যেমন কৌতুহলোদ্দিপক, একজন নও মুসলিমের জন্য যেমন উৎসাহ জাগানিয়া। একজন শিক্ষিত মুসলিমের জন্যও এখানে রয়েছে প্রচুর দরকারি পাথেয়, প্রেরণা, শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা।